রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন

আবদুর রউফ

সাধারণভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে ইদানীং দুর্বৃত্তদের বাড়াবাড়ি বড্ড বেশি চোখে পড়ে। কেবলমাত্র 'বাড়াবাড়ি' শব্দটা ব্যবহার করলে বোধ হয় সবটুকু বলা হয় না। অধিকাংশ দলে বিভিন্ন স্তরে কিছু কিছু দুর্বৃত্তই এখন দলীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ কর্তা। সর্বনাশের লক্ষণ আসলে সেটাই। নইলে বিশেষ করে ভোটের সময়, কোন কোন এলাকায় রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা দুর্বৃদতদের ব্যবহার নতুন কোন ঘটনা নয়। কিন্তু এখনকার মতো দল -দুর্বৃত্ত রাজনীতি একাকার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আগে ছিল না। এমনটা কেন হচ্ছে - প্রশ্নটা তাই স্বাভাবিক। প্রশ্নটা মাথায় নিয়ে সমস্যাটা ভাবতে শু করলে এর উৎসমূলে পৌঁছানোর জন্য খুব বেশি গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না।

প্রথমেই যেটা লক্ষ্য না করে উপায় থাকে — তা হল, রাজনীতিতে আদর্শ ব্যক্তিত্বের অভাব। প্রাক্ - স্বাধীনতা পর্বে কিংবা স্বাধীনতার পরেও কিছুকাল বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতা কথা এবং কাজে যথাসম্ভব মিল রেখে চলার চেষ্টা করতেন। অর্থাৎ কোন রকম ভণ্ডামিকে তাঁরা আত্মমর্যাদার পক্ষে হানিকর বলে মনে করতেন। তাঁদের অনেকেই আপন আপন জীবনেও চারিত্রিক উৎকর্ষে এবং মূল্যবোধের ওপর জোর দিতেন। ইদানীং এধরনের রাজনৈতিক নেতা দুর্লভ। আর্দশ চারিত্রিক গুণাবলীর জোরে দেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণের ব্যাপারটাই এখন কল্পনার বিষয়। এখন কোন নেতা যদি দুর্নীতির দায়ে ধরা না পড়েন, তাহলে তাঁকেই মনে করা হয় আদর্শ। আদর্শ হয়ে ওঠার জন্য নেতার পক্ষে উন্নত গুণাবলী অর্জনের আজকাল আর কোন প্রয়োজন পড়ে না। এমনকী যেসব নেতা ছেলেবেলায় শেখা 'মারিত গণ্ডার, লুটিত ভাণ্ডার' প্রবচনে অনুপ্রাণিত ভাণ্ডার লুট করেন তাঁদের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণের চুরি-চামারির দায়ে যাঁরা অভিযুক্ত হন তাঁদেরও আদর্শ নেতা বলেই মনে করা হয়। যুক্তি হল, আর যাই হোক, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তো আর ভাণ্ডার লুট করেননি। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায় যাঁরা যুক্ত হন, তাঁদের কারো কারো শত শত কিংবা হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারির পাশাপাশি রাজ্য সরকার পরিচালনায় যাঁরা নিযুক্ত হন তাঁদের কারো কারো কয়েক কোটি টাকার চুরি-চামারিকে আজকাল আর ধর্তব্যের নেওয়া হয় না। অর্থাৎ এত সামান্য চুরির অপরাধে তাঁদের আদর্শ নেতা হয়ে ওঠা আটকায় না।

কিন্তু চুরি বড় কিংবা ছোট, যাই হোক না কেন, প্রচারের ডামাডোলে অপেক্ষাকৃত ছোট চোরকে যতই আদর্শ নেতা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হোক- গণদেবতার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ হয় না। সেখানে চোর চোরই থাকেন, অন্তর থেকে শ্রদ্ধা তেমন নেতার জন্য কারো মনেই জেগে ওঠে না। এমনকী প্রত্যক্ষভাবে চুরি কিংবা দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত না হলেও যেসব তথাকথিত ভালমানুষ তথা সৎ নেতারা চৌর্যবৃত্তিপরায়ণদের সঙ্গে একই দলে থেকে, দলীয় সঙ্গীদের কুকর্মগুলিকে আড়াল করে রাজনীতি করেন— জনগণ তাঁদেরও অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। মনে মনে তারা ওই সব ভালমানুষ নেতাদেরও চোরদের প্রশ্রয়দাতা বাটপাড় হিসাবেই গণ্য করে। অবশ্য সামনাসামনি লোক দেখানো আচরণ কিরকম করে এবং কেন করে — সে প্রশ্ন একেবারেই স্বতন্ত্র। ভণ্ডামি এখন কেবলমাত্র নেতাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। তাঁদের সমর্থক আমজনতাও আজকাল ব্যাপারটা বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করে ফেলেছে। তাই মনের আসল ভাব লুকিয়ে রেখে কেমন করে গদগদ ভক্তি প্রদর্শনের অভিনয় করতে হয়— তাদের সেই দক্ষতা এখন দেখবার মতো।

কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধার অভিনয় যারা করে তারা যে সন্তুষ্টি রাজনৈতিক নেতার কিংবা তাঁর দলের প্রকৃত কর্মী-সমর্থক হয়ে উঠতে পারে না- একথা বুঝতে কোন অসুবিধে নেই। অর্থাৎ বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতাই এখন তাঁর চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং আদর্শবাদের জোরে কর্মী-সমর্থক জোটাতে অক্ষম। এরকম পরিস্থিতিতে দলীয় সংগঠন বাড়ানোর পন্থা কী? একমাত্র লোভ দেখানোই যে সেই মোক্ষম পন্থা— একথা বোঝার জন্য বেশ বুদ্ধি খরচের দরকার পড়ে না। চূড়ান্ত বেকারি এবং বিভিন্ন জীবিকার অনিশ্চয়তার সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষকে লোভ দেখানোটা কিছু কঠিন কাজ নয়। ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলি আজকাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কর্মী-সমর্থক জোগাড় করে নানারকম লোভ দেখিয়ে। চাকরি-বাকরি, ব্যবসার সুযোগ, ঘর-বাড়ি, জমিজায়গা এমন কী নগদ অর্থ পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রলোভন সৃষ্টির রয়েছে হাজারো কৌশল। দল সরকারি ক্ষমতায় থাকলে কেবলমাত্র লোভ দেখিয়ে দলীয় সমর্থনের গণভিত্তি তৈরি করারও আজকাল বেশ সহজ কাজ। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নামে বাড়তি কিছু পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখানো বহুক্ষেত্রেই এখন আর তেমন কার্যকরী কৌশল হিসাবে গণ্য হয় না। নইলে কেবলমাত্র এই কৌশলটিকে অবলম্বন করেই মাত্র কিছুকাল আগেও অনেক বড় বড় ভন্ড নেতার উত্থান ঘটেছিল। যাঁদের অনেকেই বহাল তবিয়তে রাজনীতিতে টিকে আছেন।

কিন্তু রাজনীতিতে টিঁকে থাকলেও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে দলের কর্মী— সমর্থকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া এসব নেতাদের পক্ষে এখন আর তেমন সম্ভব হয় না। কারণ সেই একই, শ্রমিক-কর্মচারীরাও এখন বুঝে গেছে নিজেদের কাজ বাগানোর জন্য কিভাবে আনুগত্যের অভিনয় করতে হয় আর কার্যোদ্ধার হয়ে গেলেই নেতাদের ত্রিসীমানা থেকে কেটে পড়তে হয়। সুতরাং দলীয় কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর জন্য কেবলমাত্র দেশের বিসাল বেকারবাহিনীই ভরসা। তাদেরই দেখাতে হয় নানারকম প্রলোভন। তবে নিছক প্রলোভনের উপর তাদের ধরে রাখলে খুব বেশিদিন তাদের বেগার খাটার স্পৃহা বজায় থাকে না। তাই দলের জন্য এই বিশাল বেগার খাটার বাহিনী থেকে কিছু কিছু অপেক্ষাকৃত নিরেট মস্তিষ্কের দক্ষ কর্মী বাছাই করে তাদের মাসোহারা দেওয়ার বন্দোবস্ত না করে উপায় থাকে না। বেকার তণদের জন্য এও এক ধরণের চাকরি। দল সরকারি ক্ষমতায় থাকলে এই চাকরির সঙ্গে সঙ্গে উপরি পাওনার সম্ভাবনা থাকে প্রচুর। এভাবেই নির্বাচনী রাজনীতিতে সক্রিয় বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি, এমনকী অপেক্ষাকৃত ছোট আঞ্চলিক দলগুলিও দেশের বেকারবাহিনীর কাছে সরাসরি চাকুরি প্রদানকারী সংস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বেকারবাহিনী যে কেবলমাত্র নির্বাচনী রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সরাসরি ক্যাডার পদের চাকরি পাওয়ার জন্যই উমেদার হয় এমন নয়। যাদের সুযোগ সুবিধা আছে, যারা নিজেরাই নিজেদের জীবিকার ব্যাপারটা দেখে নিতে পারে তাদের কথা এখানে হচ্ছে না। অধিকাংশই যে সেটা পারে না — একথা সবার

জানা। নেহাৎ সুবোধ প্রকৃতির ভালমানুষগুলো তার ফলে স্রেফ না খেতে পেয়েই ধীরে ধীরে অকালে ঝরে পড়ে। কেউ কেউ আত্মহত্যাও করে। কিন্তু এরকম ভবিতব্যকে মেনে নিতে সবাই চায় না। বেকারদের মধ্যে যেমন একদল থাকে যারা ডেয়ার-ডেভিল বা ডাকাবুকো টাইপের। এ ধরনের লোক অবশ্য সর্বকালে সব সমাজেই জন্মায়। সম্ভবত জন্ম থেকে বয়প্রাপ্তি পর্যন্ত যে পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশে তাদের লালন-পালন হয়, সেই পরিবেশ এবং সেখান থেকে পাওয়া সঙ্গী-সাথীরাই তাদের ডেয়ার-ডেভিলে রূপান্তরিত করে। তাদের স্বভাবটাই হয়ে ওঠে আক্রমণাত্মক। জীবিকার সমস্যার কারণে জীবনের অভাব-মেটানোর ব্যাপারগুলোকে তারা নিজেদের ডেয়ারডেভিল স্বভাবের কারণেই অন্যের অনুগ্রহের উপর ছেড়ে দিতে রাজি হয় না। আইনি রাস্তায় জীবিকার সংকট মোচনের উপায় না থাকলে বে আইনি রাস্তা অবলম্বনে বিপদের সম্ভাবনাকে তারা পরোয়া করে না। সমাজে দুবৃর্ত্তদের দল ভারী করে তারাই। বেআইনি রাস্তা বিপদ সঙ্কুল হওয়ায় প্রয়োজনের তাগিদেই তারা হয় সংগঠিত এবং সশস্ত্র। দলবদ্ধভাবে সশস্ত্র হিংস্রতা প্রদর্শনই হয়ে ওঠে তাদের কার্যোদ্ধারের পদ্ধতি। অসংগঠিত, নিরস্ত্র সাধারণ মা মানুষ তাই তাদের ভয় করে চলতে বাধ্য হয়। এইসব দুবৃর্ত্তরাও বেশ পরিকল্পিত ভাবেই জনসাধারণের মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে। সংগঠিত দুর্বৃত্তদের সন্ত্রাস সৃষ্টির এই বিশেষ ক্ষমতাটাকেই কোন কোন রাজনৈতিক নেতার তরফে মাঝে মাঝে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। কারণ, চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং আদর্শবাদের জোরে যেক্ষেত্রে শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তোলা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে জনসাধারণের ওপর নেতাগিরি বজায় রাখা এবং দলের দাপট বহালরাখার জন্য ভয় দেখান ছাড়া উপায় কী ?

ভয় দেখান ছাড়াও রাজনীতির ময়দানে দুর্বৃত্ত ব্যবহারের অন্য কারণ থাকে। সেই বিশেষ কারণটাই বর্তমান আলোচনার সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ। ভোটের মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতা দখলের নিরীহ রাজনীতিতেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে মাঝে মাঝে হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়— একথা ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। বিশেষ করে নির্বাচনী এলাকায় প্রভাব-প্রতিপত্তির একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়। এ ব্যাপারে কোন আপোষ চলে না। নিজেদের প্রভাবাধীন এলাকায় ভীতিপ্রদর্শনের একচেটিয়া অধিকার প্রতিদ্বন্দী দলকে বিন্দুমাত্রও ছেড়ে দেয়া যায় না। দিলেই মরণ। এলাকার জনসাধারণের যদি একবার মনে হয় এই দলটাকে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই, এরা ভয় দেখালেই প্রতিদ্বন্দী দলের আশ্রয় বা প্রশ্রয় পাওয়া যাবে তাহলেই দলের দফারফা। কারণ আগেই বলেছি, ভয়ের বাতাবরণ জিইয়ে রাখতে পারাই প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার এখন একমাত্র পদ্ধতি। কোন দল কতখানি ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে তাই নিয়ে কোনও কোন্য এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাঝে মাঝে এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে, তখন সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। এইভাবে যুযুধান দলগুলি যখন মুখোমুখি সংঘর্ষে নেমে পড়ে তখনই দেখা দেয় আসল সমস্যাটা। সেরকম সংঘর্ষ বা রক্তারক্তি কাণ্ডের সম্ভাবনা দেখা দিলে ফ্রন্ট লাইনে এগিয়ে যাবে কারা? আগেই বলেছি, ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নেতাদের চারিত্রিক গুণাবলী এবং আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ ক্যাডারের সংখ্যা ইদানীং প্রায় শূন্যের কোটায় এসে ঠেকেছে। সুতরাং আন্তর্দলীয় সংঘর্ষে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকলে স্বেচ্ছায় ফ্রন্ট লাইনে এগিয়ে যাওয়ার মতো ক্যাডার খুঁজে পাওয়া এখন সত্যিই বেশ মুশকিল। এরকম পরিস্থিতির সঙ্গে মাস হিস্টিরিয়ার ব্যাপারটিকে গুলিয়ে ফেললেচলবে না। কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে মিছিল আইন-অমান্য ইত্যাদির নামে মক ফাইটের পরিবেশ তৈরি করে দলের কর্মী-সমর্থকদের ক্ষেপিয়ে তুলে পুলিশের সঙ্গে কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের নামে মাস হিস্টিরিয়াগ্রস্ত লোকগুলোকে যে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া যায়— সেকথা ঝানু পেশাদার রাজনৈতিক নেতারা বেশ ভাল করেই জানেন।

কিন্তু যেখানে শান্ত পরিবেশে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রভাবকে খর্ব করার জন্য সংঘর্ষে নামার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ , উৎসগীকৃতপ্রাণ ক্যাডারের অভাব ঘটলে কাদের উপর ভরসা, করে লড়াইয়ে নামা হবে? যারা সামান্য মাসোহারার বিনিময়ে হোলটাইমার, কিংবা যারা কোন জীবিকার সন্ধানে অথবা অবলম্বিত জীবিকার নিরাপত্তার স্বার্থে উমেদারির মনোভাব থেকে পার্টির কর্মী কিংবা সমর্থক, খুব কম জনই তাদের ভেতর থেকে প্রাণহারানোর সম্ভাবনা সত্ত্বেও রক্তাক্ত সংঘর্ষের ফ্রন্ট লাইনে এগিয়ে যেতে সম্মত হবে। এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্যেই নেতাদের অনিবার্যভাবে নির্ভর করতে হয় দুর্বৃত্তদের ওপর। কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দী দলের সঙ্গে সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই নয় অনেক সময় একই দলের অভ্যন্তরে কোন কোন নেতা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী নেতার প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্যও দুর্বৃত্তদের সাহায্য নিয়ে থাকেন। সেয়ানা দুর্বৃত্তরাও এরকম সুযোগেরই অপেক্ষায় থাকে। নেতারা চাইলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তারা এক পায়ে খাড়া থাকে। বিনিময়ে তারা দাবি করে রাজনৈতিক প্রশয়, যা তাদের দেয় পুলিশের বিদ্ধে সুরক্ষা। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক প্রশ্রয় থাকলে কখনো কখনো সংগঠিত জনমতের বিদ্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে গণরোষের হাত থেকে আত্মরক্ষার সুযোগও তারা পেয়ে যায়। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনমতকে বিভ্রান্তি করার কাজটি সবচেয়ে সুচারূরূপে সম্পন্ন করাটা যে ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষেই সম্ভব— একথাটা দুর্বৃত্তদের ভালভাবেই জানা আছে।

তাই দুর্বৃত্তদের চতুর দলপতিরা সব সময়ই সন্ধান করে প্রভাবশালী ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়। সুতরাং প্রয়োজনটা যে উভয় তরফেই সমান সমান— একথা বুঝতে কোন অসুবিধে নেই। উদ্বুদ্ধ ক্যাডারবাহিনী যত কমে যাচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের দুর্বৃত্ত নির্ভরতা ততই বাড়ছে। দুর্বৃত্ত-দলপতিরা ব্যাপারটা বোঝে, আর তারা এটাও জানে, বর্তমানে নির্বাচনী রাজনৈতিক দলগুলির ভেতর আদর্শবাদ চুলোয় গেছে। আর ওই সব দলের নেতাদের যা চরিত্রবল তাতে তাঁদের পক্ষে উদ্বুদ্ধ ক্যাডার তৈরী করা কিছুতেই কসম্ভব নয়। তাই ডেয়ার-ডিভিল দুর্বৃত্তদের দলের কর্মী-সমর্থক হিসাবে রিক্রুট করার প্রবণতা বাড়ছে। বেশির ভাগ ভোট-সর্বস্ব দলেই তাদের এখন বিপুল চাহিদা। আর এভাবেই রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তরা জাঁকিয়ে বসার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। আজকাল কোনও কুখ্যাত দুর্বৃত্ত খোলাখুলি কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে তাকে প্রশ্রয়দানকারী সংশ্লিষ্ট দলীয় নেতার প্রাথমিক কাজ হয় ওই দুর্বৃত্তটির হয়ে সাফাই গাইতে শু করা। এই সাফাইয়ের বয়ানগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারমত একই রকমের হয়। বলা হয়, দুর্বৃত্তটি নাকি ভাল হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তাঁদের দলে এসেছে। প্রায় অকাট্য যুক্তি দেখানোর মতো করে প্রশ্ন তোলা হয়, আগের রেকর্ড যা কিছু খারাপ থাকলেই কেউ কি ভাল হয়ে উঠতে পারে না ? সত্যিই পারে কিনা, সেটা অন্তত আগে টেস্ট করে নেওয়া হোক— কে আর বলবে সে কথা ? দুর্বৃত্তটি তাই প্রায় বিনা বাধাতেই দলভুক্ত হয়ে যায়। তখন বুক ফুলিয়ে প্রগাশ্যে পার্টির পরিচয় নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে, তার আর কোন অসুবিধাই হয় না। ঠিক যেন পার্টির শৃঙ্খলাপরায়ণ কর্মী। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এলাকার মানুষ ঠিকই টের পায়, পার্টির ক্যাডার বনে গেলেও দুর্বৃত্তটির স্বভাব-চরিত্র আদৌ বদলায় নি এবং বদলানোর কোন গরজও তার নেই। সে সত্যিই বদলে যাক— নেতারাও সেটা চান না। দল তাকে ব্যবহার করতে চায় দুর্বৃত্ত হিসাবেই। দুর্বৃত্ত ক্যাডারটির যখন সেকথা জানাই থাকে— সে আর বদলাবে কোন দুঃখে।

কিন্তু পার্টির তথাকথিত ক্যাডার বনে গেলেও দুর্বৃত্তরা যে সবসময় নেতাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে এমন নয়। আস্তে আস্তে দলীয় সংগঠনের ভেতরেও নিজেদের ক্ষমতার বহর এবং গুত্ব তারা টের পেতে থাকে। ফলে কখনও কখনও হুকুম তালিম করার পরিবর্তে হুকুমকারীর ভূমিকায় উত্তীর্ণ হওয়ার আকাঙ্খাও তাদের পেয়ে বসে। আর তখনই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলটির পক্ষে ব্যাপারটি হয়ে ওঠে বিপর্যয়কারী। এ অবস্থায় দলটি সরকারি ক্ষমতায় থাকলে পুলিশের সাহায্যে পার্টি ক্যাডারে রূপান্তরিত দুর্বৃত্তদেরও শায়েস্তা করার প্রক্রিয়া অবলম্বনে বাধ্য হয়। তেমনটা করলে দলীয় সাংগঠনিক ক্ষমতার কিছু ক্ষতি হয় বটে কিন্তু প্রচারের কৌশলে দলের ভাবমূর্তি উজ্জবল করার বাড়তি সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু পুলিশ হাতে না থাকলে দলীয় সংগঠনের অন্দরমহলে ঢুকে পড়া দুর্বৃত্তদের নিয়ন্ত্রণের আর কোন উপায় থাকে না। তখন জনগণের সামনে দলের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য বেপরোয়া মিথ্যাচার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। দলীয় ক্যাডারে রূপান্তরিত দুর্বৃত্তরাই নেতার আসনে বসে গেলে তাদের কুকর্মগুলি ক্রমাগত অস্বকার করে এন্তার মিথ্যা বলা ছাড়া আর করারই বা কী থাকে? এরকম বেপরোয়া মিথ্যাচারকে আশ্রয় করেই নব্য নেতায় রূপান্তরিত দুর্বৃত্তরা নিজেদের হিরো বানানোর আপ্রাণ প্রয়াস চালাতে থাকে। জনসাধারণের দুর্বল স্মৃতির সুযোগ নিয়ে তাদের কেউ কেউ

কালক্রমে সত্যি সত্যিই রাজনৈতিক নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। গণমানসে কতখানি শ্রদ্ধার আসন পায় সে প্রশ্ন অবশ্য স্বতন্ত্র।

তাছাড়া গণমানসে কী প্রতিক্রিয়া হল তাই নিয়ে আজকাল মাথা না ঘামালেও চলে। কারণ, প্রায়ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে জনসাধারণের অনুগত্য আদায় করা হয়। তাদের শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধায় কিছু যায় আসে না। কিন্তু তবুও গণধিক্কারের ব্যাপারটা এড়িয়ে চলার একটা প্রয়াস থাকেই। কারণ, গোপন ব্যালটে কখন যে কী ঘটে যায় কিছুই বলা যায় না। রিগিং মেশিনারি সব ক্ষেত্রেই যে গণমতের তোয়াক্কা না করে প্রার্থিত রায় এনে দেবে— তেমন কোন গ্যারান্টি নেই। তাই দুর্বৃত্তরাই দলপতি হয়ে উঠলে অসুবিধা ঘটেই। কোনও কোনও দুর্বৃত্ত হয়তো এলাকা বিশেষে রবিন হুড কিংবা বিশু ডাকাত, কিন্তু বাকি দেশবাসীর কাছে তারা ক্রিমিন্যাল ছাড়া আর কিছু নয়। তাই ক্রিমিন্যালরা দলের নেতা হয়ে বসুক— এটা সাধারণভাবে কোন দলের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু পুলিশি ক্ষমতা হাতে না থাকলে ক্রিমিন্যালদের নেতা হয়ে ওঠাকে ঠেকানো যায় না। যে দল সরকারে থাকার সুবাদে পুলিশি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে তারা কিছুতেই হুকুম তামিলকারী দুর্বৃত্তকে হুকুমকারীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা পেতে দেয় না। পুলিশি গুঁতোর চোটে বুঝিয়ে দেওয়া হয় ঘটনা চক্রে পার্টি ক্যাডার হয়ে উঠলেও ক্রিমিন্যালদের সীমা আসলে কতদূর। কিন্তু তাই বলে উচ্চাকাঙ্খী দুর্বৃত্তদের সবাইকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয় এমন নয়। তদের প্রশয়দানকারী রাজনৈতিক নেতারা যখন দেখেন, পুলিশি গুঁতো খেয়ে হামবড়া দুর্বৃত্তরা হুকুমকারী ভূমিকা থেকে আবার হুকুম তামিলকারী ভূমিকায় মানিয়ে নিতে শু করেছে, তখনই তাদের মাফ করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ওই সব নেতারা আবার নতুন করে এই সব হুকুমবরদার দুর্বৃত্তদের ভাল হয়ে ওঠা সম্পর্কে জনসাধারণের সামনে সাফাই গাইতে শু করেন।

এসব কথা বলার অর্থ এই নয় যে, আমাদের দেশে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী দলগুলির রাজনীতি পুরোপুরি দুর্বৃত্তায়নের খপ্পরে পড়ে গেছে। কিন্তু আদর্শহীন এবং চরিত্রহীন বহু নেতা আপন আপন দলের ভেতর এবং এলাকায় নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য যেভাবে উত্তরোত্তর দুর্বৃত্ত নির্ভর হয়ে পড়ছেন তাতে আগামী দিনে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির এরকম দুর্বৃত্তায়নের ফলে ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনীতি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। জনপ্রিয়তা লাভ করছে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসবাদীরাও। কারণ, বর্তমান পরিস্থিতিতে, তারা কেবল মাসোহারা ভিত্তিক কর্মী নয়, আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ ক্যাডার সৃষ্টিরও ক্ষমতা রাখে। তা সেই আদর্শবাদ যতই ভ্রান্ত হোক না কেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন যত বাড়ছে ততই যে ধর্মীয় মৌলবাদী এবং ভ্রান্ত বিপ্লববাদী তথা সন্ত্রাসবাদীদের সুবিধা হচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতাদের তাই বোঝা উচিত, দুর্বৃত্তদের দ্বারা সন্ত্রস্ত জনগণের ঘৃণা কুড়িয়ে দীর্ঘকাল টিঁকে থাকা যায় না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com